Vol. 2 | No. 1 | 1958

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বসন্তকুমারী নাটক : মীর মশাররফ হোসেন

Volume	2
Issue	1
Year	1958
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুনীর চৌধুরী
Published online	June 15, 1958
DOI	10.62328/sp.v2i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v2i1.2
Pages	29-39
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বসন্তকুমারী নাটক ঃ মীর মশাররফ হোসেন

Check for updates

মুনীর চৌধুরী

মীর মশাররফ হোসেন রচিত ১২৯৪ সালে প্রকাশিত বসন্তকুমারী নাটকের একখানি 'দ্বিতীয় সংস্করণ' রাজসাহী বরেন্দ্র মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশ করেছেন আইনদ্দীন বিশ্বাস। ছাপা হয়েছে ময়মনসিংহ থেকে, চারুচন্দ্র প্রেসে, ম্যানেজার শ্রীউমাকান্ত রক্ষিত কর্ত্তৃক। নাট্যাংশের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৯, দাম রাখা হয়েছিল আট আনা মাত্র।

প্রথম বারের 'বিজ্ঞাপন'টি এই 'দ্বিতীয় সংস্করণে'ও পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। তা থেকে জানা যায় যে এ বই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল মাঘ মাসে, ১২৭৯ সালে, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে। সাহিত্য সাধক চরিতমালায় ব্রজেন বাবু এই তারিখই গ্রহণ করেছেন এবং ঐ একই সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত 'গোরাই ব্রীজ বা গৌরী সেতু' কাব্যগ্রন্থকে মীর মশাররফ হোসেনের দ্বিতীয় রচনা এবং বসন্তকুমারীকে তৃতীয় গ্রন্থ বলে অভিহিত করেছেন। উভয় গ্রন্থের প্রকাশকালের মধ্যে ব্যবধান মাত্র তের দিনের। কিন্তু মুদ্রিত অবস্থায় আত্মপ্রকাশের সনতারিখের সংগে রচনাকালের ধারাবাহিকতার মিল সব সময়ে নাও থাকতে পারে। এমনও হতে পারে যে বসন্তকুমারী পরে ছাপা হলেও লেখা হয়েছিল আগে এবং রচনাকালের ক্রম অনুসারে মীর মশাররফ হোসেনের গ্রন্থসমূহের পরিচয় দান করতে হলে বলা সঙ্গত হবে যে তাঁর প্রথম সৃষ্টি রত্নবতী উপন্যাস, ১২৬৭ সালে বা ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয় রচনা বসন্তকুমারী নাটক, ১৮৭৩ সনে। তৃতীয় গ্রন্থ গোরাই সেতু, কাব্য, ১৮৭৩ সনে। বসন্তকুমারী নাটকের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে মীর মশাররফ হোসেন নিজেই বলছেন—"আমার অনুরাগ তরুর দ্বিতীয় কুসুম বসন্তকুমারী নাটক প্রস্ফুটিত হইল।"

মীর মশাররফ হোসেনের জীবন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নিতান্ত পরিমিত এবং অসম্পূর্ণ। তাঁর রচনার সংগেও আমাদের পরিচয়ের বহর দুঃখজনক ভাবে

সীমাবদ্ধ। তিনি পঁচিশ থেকে ছত্রিশ খানা বই লিখেছেন। তার মধ্যে আমরা কেউ পাঁচ থেকে সাত খানার বেশী পড়িনি। শীগগির যে পড়তে পারব এমন কোন সম্ভাবনাও দেখা দেয় নি। সমসাময়িক যে সমস্ত পত্র পত্রিকা শিল্পীর কর্মজীবনের নানা দিকের পরিচয় প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষভাবে ধারণ করে আছে সে সমস্ত সাময়িক পত্রের কোন হদিস এখন পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। সেইজন্যে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ঘটনা এবং তাঁর রচনার এক অতি ক্ষুদ্রাংশের উপর নির্ভর করেই আমরা মীর মশাররফ হোসেনের ব্যক্তিজীবন ও শিল্পী-মানসের পূর্ণ পরিচয় দিতে প্রয়াসী হই। এই বিচার ও মীমাংসা অনেকখানিই কল্পনানির্ভর। মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' এমনকি 'এসলামের জয়' যে জীবনবোধের পরিচায়ক তার মধ্যে এক ধার্মিক-প্রেমিক-স্বাপ্নিক পুরুষ-প্রতিভার হৃৎস্পন্দন অনুভব করা যায়। মনে হয় যেন এই শিল্পী কোলাহলের নয়, নিসঙ্গতার; সমাজের নয়, জীবনের; প্রতিষ্ঠানের নয়, হৃদয়াসনের। এই রকমই একটা ধারণা জন্মে যে, দেশের আন্দোলনের বিক্ষোভের অংশীদার হয়ে জাতির বিড়ম্বিত ভাগ্যকে কল্যাণমণ্ডিত করে তোলার চেয়ে এই শিল্পীর অধিকতর আগ্রহ নিয়তি-নিপীড়িত মানুষের দেহের পরিসীমার মধ্যে যে বেদনা-দাহ-মন্থন-জাত হলাহল-অমৃতের সৃষ্টি হয় তারই বন্দনা করা। এবং এই ধারণাই আরও প্রশ্রয় পায় যখন জানি যে জীবনের অধিকাংশ কালই তিনি কাটিয়েছেন মহানগরী কলিকাতার কর্মমুখর ঘূর্ণাবর্ত থেকে অনেক দূরে— গ্রামে— ময়মনসিংহে, দেলতুয়ারে। এইজন্যে অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর একটি সুলিখিত তথ্যবহুল প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন যে ''মশাররফ হোসেনের সাহিত্যিক জীবনে এক আশ্চর্য নির্লিপ্ততা লক্ষ্য করা যায়। এ নির্লিপ্ততার অর্থ শিল্পী জীবনের নিঃসঙ্গতা, সমাজ সম্পর্কে উদাসীনতা নয়। তাঁর সমাজ সচেতনতা যে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল তাঁর 'জমিদার দর্পণ,' 'গাজী মিয়ার বস্তানী' এবং 'বাজীমাৎ' প্রভৃতি গ্রন্থই তার সাক্ষ্যবহন করছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোন রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষভাবেও তিনি জড়িত ছিলেন না। কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত না থাকার জন্যে তিনি যে তাঁর সমকালীন গুণী ব্যক্তিদের গুণ গ্রহণ করেন নি তাও নয়। তাঁর সাহিত্যগুরু কাঙ্গাল

হরিনাথের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আসক্তি ছিল এবং মুসলিম সাহিত্য ও জাতিপ্রাণ নবাব আবদুল লতিফের নামে তিনি তাঁর বসন্তকুমারী নাটকও উৎসর্গ করেছিলেন। নবাব আবদুল লতিফের উদ্যোগে এবং সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ মনীষীদের সহায়তায় মুসলমানদের কৃষ্টি সচেতন করে তোলার জন্য ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের দিকে কলকাতায় Muhamedan Literary Society নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং তাঁর জীবদ্দশায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিও গঠিত হয়, তবুও এগুলোর সংগেও তাঁর সমগ্র সাহিত্যিক জীবনে কোন যোগ দেখি না।……জীবনের হৈ চৈ কি মানুষের সঙ্গে দহরম মহরম তিনি খুব পছন্দ করতেন না।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৭০—৭১)

এই উক্তি মীর মশাররফ হোসেনের কবিমানসের জটিলতাকে যে পূর্ণরূপে চিত্রিত করে না, এরূপ মনে হওয়া অসঙ্গত নয়। কারণ তাঁর নানা গ্রন্থে তীক্ষ্ণ সমাজসচেতনতা সেই সমাজের নানা গ্লানি ও আবিলতা সম্পর্কে তাঁর ক্ষোভ ও রোষ ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বহ্নিশিখায় প্রদীপ্ত হয়ে শিল্পরূপ লাভ করেছে। 'জমিদার দর্পণে' তার স্বাক্ষর এত জ্বলন্ত যে বঙ্কিম পর্যন্ত এর নাটকীয় সার্থকতাকে স্বীকার করেও এর ভাবের অগ্ন্যুদগরণকে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি। 'গাজী মিয়ার বস্তানী'র নির্মম উল্লাসপূর্ণ কশাঘাতে সমসাময়িক মুসলিম অভিজাত জমিদার শ্রেণী যে মর্মান্তিকরূপে পীড়িত ও অপমানিত বোধ করেছিলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। এমন কি 'বিষাদ সিন্ধু'র শোকতরঙ্গ প্রবাহের অন্তরালে লেখক সমসাময়িক মুসলিম সমাজের ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতা এবং অনুদার শিল্পবোধের বিরুদ্ধে সরাসরি আঘাত হানতেও কার্পণ্য করেন নি। তৎকালীন সমাজ জীবনের নানা বিচ্ছিন্ন ও সংঘবদ্ধ আলোড়নের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ যে খুবই প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় ছিল এগুলো তারই ইঙ্গিত বহন করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলিম পুনর্জাগরণের শেষ কম্পিত শিখা—ওয়াহাবী আন্দোলনের মৃদুতম বিকাশকেও যখন ব্রিটিশ সরকার কঠোর হস্তে একেবারে নির্বাপিত ও নিশ্চিহ্ন করে দিলেন মুসলিম চেতনার সেই নিরানন্দ অন্ধকার যুগে মীর মশাররফ হোসেনের আবির্ভাব। তাঁর সাহিত্যখ্যাতির উন্মেষকালে মুসলমানের আত্মসচেতনতার নবীন প্রচেষ্টাস্বরূপ যে সমস্ত সাহিত্য

প্রতিষ্ঠান ও মতনির্ভর দল গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে মীর মশাররফ হোসেনের কোন সম্পর্ক ছিলনা একথাও হয়ত পূর্ণ সত্য নয়। সে সম্পর্ক হয়ত নিরবচ্ছিন্নরূপে মৈত্রী বা সহযোগিতার ছিল না, কিন্তু তাই তাঁকে উদাসীন বা নির্লিপ্ত বলে কিছুতেই ভাবা যায় না। বরঞ্চ এ রকম সন্দেহ করার কারণ আছে যে সে সম্পর্ক ক্রমে ঘোরতর বৈরীভাব ও পূর্ণ বিরোধিতায় পরিণতি লাভ করে মীর মশাররফ হোসেনের জীবনবোধ ও শিল্পাদর্শ তাঁকে বঙ্গদর্শন-প্রদীপ-ভারতীর পরিমণ্ডলের দিকে আকৃষ্ট করেছে, বঙ্কিম-অক্ষয় মৈত্র সেই মৈত্রী স্থাপনের সেতু হিসেবে কাজ করেছেন। অন্যপক্ষে কাব্যবিশারদ কায়কোবাদ, সমাজসেবক রেয়াজুদ্দীন মাশহাদী মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্যকর্মকে গ্রহণ করেন নি। তাঁর জীবনদর্শনের প্রতি সরব ধিক্কার জানিয়েছেন, তাঁর সামাজিক মৈত্রী স্থাপনের অবাস্তব প্রচেষ্টাকে আদালতের কাঠগড়ায় টেনে নিয়ে তিরস্কৃত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। রেয়াজুদ্দীন মাশহাদীর 'অগ্নিকুক্কুট' আজও তার সাক্ষ্য, কায়কোবাদের 'মহররম শরীফ' কাব্যের বিদ্রূপাত্মক ভূমিকা তার প্রমাণ। এমনকি উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত সাহিত্য সভা সমিতিতে যোগদান না করার সচেতন সংকল্পের কথা 'বিবি কুলসুম' বইতে পর্যন্ত একবার ইশারায় বলা আছে। তখনকার দিনের মুসলিম পরিচালিত খ্যাতিসম্পন্ন পত্রিকা ও প্রতিষ্ঠানাদির সঙ্গে যে তাঁর কোন যোগ বা সম্পর্ক ছিল না বলে আজকে আমাদের যে ধারণা, তা এই কারণেই ভ্রমযুক্ত বলে মনে হয়। নতুবা, Muhamedan Literary Society র সঙ্গে তাঁর সাংগঠনিক সম্পর্ক না থাকলেও 'শ্রীযুক্ত মৌলভী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুরের' প্রতি যে মীর মশাররফের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার ও কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিলনা তার প্রমাণ মীর মশাররফ হোসেনের 'অনুরাগ তরুর দ্বিতীয় কুসুম' বসন্তকুমারী নাটকের উপহার-লিপি।

"পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মৌলভী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর শ্রদ্ধাস্পদেষু —মহামহিম মিত্র! আপনি আমাদের সমাজের একটি রত্ন।······ বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি আপনার অকপট স্নেহ······।" ইত্যাদি

বসন্তকুমারী নাটকের শিল্পরূপ ও ভাবকল্পনার মধ্যে তেমন কোন মৌলিকতা

বা বিশিষ্টতা নেই। তবে শিল্পীর সাহিত্যসাধনার পরীক্ষা নিরীক্ষার কালের রচনা হিসেবে এ নাটকটি বিশদভাবে আলোচনাযোগ্য। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রসমূহ মুসলমান সমাজ থেকে গৃহীত হয় নি, এমন কি তাঁরা সমাজের সাধারণ মানবগোষ্ঠির মধ্যেও পড়েন না। রাজা-বিদূষক, রাজপুত্র-রাজমন্ত্রী এবং রাণী-রাজকন্যার জীবন নিয়ে লেখা নাটক। তাঁদের আচরণে-আলাপে কর্ম ও আবেগে এ জাতীয় কাহিনীর বাহ্যিক কাঠামোর কোন ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু তবু তারই রন্ধ্রে রন্ধ্রে, হৃদয়ের প্রগাঢ় দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভ চিত্রণে, বিভিন্ন চরিত্রের অন্তর-গত সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য সম্পাদনে ক্রিয়াময় রঙ্গরস-সৃজনে মীর মশাররফ হোসেনের নাট্যপ্রতিভার সজীব স্পন্দন মাঝে মাঝে অনুভব না করে উপায় নেই।

নাটকের 'প্রস্তাবনা', সংস্কৃত নাটকের যে রীতি রঙ্গমঞ্চে তখন প্রায় সকলের উপরই ভর করেছিল, তার অনুকরণ মাত্র। কিন্তু প্রাণহীন রীতিও যে প্রাণবন্ত কল্পনার স্পর্শে, আবেদনক্ষমতায় কত বিদ্যুদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে পারে, 'বসন্তকুমারী নাটকের' প্রস্তাবনা তার এক প্রকৃষ্ট নজীর।

নটী। নাথ আপনিও আমোদ প্রমোদ নিয়েই আছেন। তা যা হোক, আমায় কি করতে হবে আজ্ঞা করুন।

নট। আজকাল ভদ্র সমাজে নাটকের অভিনয়ই প্রধান আমোদ বলে গণ্য হয়েছে। অতএব প্রিয়ে! তোমায় আজ একটি নুতন নাট্যাভিনয় করতে হবে। ...... (কিঞ্চিৎ স্তব্ধ থাকিয়া) কিছুদিন হোলো শুনেছি বসন্তকুমারী নামে একখানি নাটক প্রকাশ হয়েছে, অদ্য তারই অভিনয় করা যাক।

নটী। বসন্তকুমারী!!! কার রচিত?

নট। কুষ্টিয়া নিবাসী মীর মশাররফ হোসেন রচিত।

নটী। ছি!! এমন সভায় মুসলমানের লিখিত নাটকের নাম কোল্লেন!

নট। কেন? মুসলমান বলে কি একেবারে অপদস্ত হলো?

নটী। তা নয়, এই সভায় কি সেই নাটকের অভিনয় ভাল হয়? হাজার হোক মুসলমান!

নট। অমন কথা মুখে আনিও না। ঐ সর্বনেশে কথাতেই ভারতের সর্বনাশ হচ্ছে।

নটী। নাথ। ক্ষমা করবেন। আপনার আজ্ঞা আমার শিরধার্য্য।

নটীর এবং সেই সঙ্গে. জাতি-বৈর ভাবে আচ্ছন্ন দর্শকমণ্ডলীর চিত্তশুদ্ধির এই কৌশলী প্রক্রিয়ার পর নট প্রথমে কিঞ্চিৎ নৃত্যগীত দ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করার জন্য নটীকে অনুরোধ করে। পটীয়সী নটী তার স্বভাবজাত চটুল সলজ্জতার প্রদর্শনী করে সে অনুরোধ রাখতে রাজী হতে চায়না। তখন নট বলছে —

"দেখ প্রিয়ে। এটি তোমাদের স্বভাব। পারো সব, করো সব, কেবল লোকে বল্লেই লজ্জা জানাও।"

অতঃপর নৃত্য-গীত এবং নাটক আরম্ভ।

ইন্দ্রপুরের রাজা বীরেন্দ্রসিংহ বৃদ্ধ বয়সে বিপত্নীক হয়েছেন। দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহের কোন গোপনাভিলাসও তাঁর হৃদয়ে নেই। তিনি তরুণ যুবরাজকে বিবাহ দিয়ে তাঁকেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখতে চান। কিন্তু রাজমন্ত্রী বৈশম্পায়ন বিচক্ষণ লোক। রাজকার্য পরিচালনায় বার্ধক্য যে কেবল আশীর্বাদস্বরূপ তা নয় একেবারে অপরিহার্য সে বিষয় তাঁর কোন সন্দেহ নেই। তিনি রাজার মনোবাঞ্ছার প্রতি কোনরকম অসম্মান প্রদর্শন না করেই বলছেন ঃ

যুবরাজ প্রজারঞ্জন কোরে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন কোরবেন, তাতে বিন্দু-মাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু যৌবন কাল অতি ভয়ানক কাল।···ভূপতিগণের, ভূপতিগণের কেন—মনুষ্য মাত্রেরই প্রধান শত্রু কাম রিপু।···সুরলোকেও···। দেখুন সেই ভয়ানক শত্রু দমনে অক্ষম হয়ে সুরপতি ইন্দ্র গুরুপত্নী হরণ করে কেমন দুর্দ্দশায় পতিত হয়েছিলেন।··· কেবল এই অদমনীয় রিপুর ছলনায় লঙ্কাধিপতি সবংশে বিনাশ হয়েছেন।

কিন্তু তা হোক। রাজা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যুবরাজের বিবাহ অবিলম্বে সম্পন্ন করতে হবে, এবং তার পূর্ণ অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদনের আয়োজনও শুরু হয়। অন্যদিকে রাজমন্ত্রীর সঙ্গে যোগদান করেছে রাজবিদূষক প্রিয়ম্বদ। পত্নী বিরহিত জীবন যে কী দুর্বিষহ, কী যন্ত্রনাময়, কী শূন্যতাপূর্ণ, একথা প্রিয়ম্বদ রাজাকে

দিয়ে উপলব্ধি করাবেই। পুষ্পোদ্যানে প্রকৃতির শোভাময় সুরভিত অমৃত সুধা পানে রাজা মুগ্ধ ও তুষ্ট। কিন্তু প্রিয়ম্বদ তা স্বীকার করতে নারাজ ঃ

"ফুল দেখলে মন খুশী হয়' এও কি একটা কথা! কোথায় ফুল আর কোথায় মন! সম্বন্ধও ভারি! কী মজার কথা, ছোঁবনা, খাবনা, দেখেই খুশী এমন মনকে আর কি বলব মহারাজ! ···দেখুন এই উদর, এই অর্থভাণ্ডার, ইনি পূর্ণ থাকলে ফুল না সঁুকলেও মন খুশী হয়।··· সে কি মহারাজ? বলেন কি? কিসের বয়েস? আপনার চুল পাকছে? কৈ আমিত একটিও পাকা দেখতে পাইনা। একটিও ত কাল হয় নাই। যেমন সাদা, তেমনি ধবধব করছে। তবে আপনি বিয়ে করবেন না কেন? কিসের বয়েস? আপনার যে বয়েস, এরচেয়ে কত অধিক বয়েসে কত শত লোকে বিয়ে করে বংশ রক্ষা কোরেছে। সামান্য কথায় বলে থাকে যে স্ত্রী মলে ঘর শূন্য হয়। আপনার কোটা ঘর বলে কি আর শূন্য হবেনা?"

এমন শক্তিশালী যুক্তি ও আবেদনের সামনে রাজা অটুট থাকতে পারলেন না। তার চিত্তশক্তিতে একটু একটু করে ফাটল ধরতে শুরু হোলো এবং ক্রমে কোন নবীনা যুবতীকে স্ত্রী হিসেবে হৃদয় ও রাজপুরীতে গ্রহণ করাই স্থির করলেন।

ওদিকে ভোজপুরের বসন্তকুমারী পটাঙ্কিত যুবরাজ নরেন্দ্র সিংহের চিত্র দেখা অবধিই একরূপ বিবশ-বিহ্বল অর্ধমৃত অবস্থায় দিনপাত করছিলেন। পটের চিত্র প্রথমে তার সকল স্বপ্নকে গ্রাস করেছে, তারপর তার জাগ্রত চেতনায় প্রতিফলিত বিশ্বকে পর্যন্ত লুপ্ত করে দিয়েছে। ধ্যানমগ্না রাজকুমারীর পশ্চাৎ দেশ থেকে তার সখীও যদি ছুটে এসে দুই হাতে চোখ ঢেকে ধরেন তখনও রাজকুমারীর মনে হয় এ কোমল পেলব হাত নিশ্চয় বীরবর নরেন্দ্রের—তাই চমকিত ভাবে বলে ওঠেন ঃ

"আর কেন জ্বালাও, দুখানি পায়ে ধরি, অবলা বালা, অন্তরে আর আঘাত দিও না। নাথ! আমি বালিকা, এ চাতুরির অর্থ আমি কি বুঝিব।" ইত্যাদি

বসন্তকুমারীর পিতা কুমারী কন্যার এই অহেতুক বিকার, এই শোকাহত মূর্তি, এই রুগ্ন-বিবশা রূপ দেখে বিচলিত হয়ে তাকে ডেকে পাঠান। এবং কারণ

জানতে চান, যাতে সম্ভাব্য সকল রকম প্রতিকারের ব্যবস্থা করা যায়। পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী বসন্তকুমারী আপন হৃদয়ভাব প্রচ্ছন্ন রাখার যে করুণ এবং নাটকীয় প্রয়াসে লিপ্ত হচ্ছেন তা উল্লেখ করার মত। প্রথমে সখীকেঃ

> "আমার কিছু হয় নাই। আমি তোমার পায়ে ধরি, তুমি আমার মাথা খাও, আমাকে বিরক্ত কোরোনা।…
>
> (রাজাকে মৃদুস্বরে) আমার কোন অসুখ হয় নাই।…
>
> (কাঁদিতে কাঁদিতে) পিতঃ আমার কোন অসুখ হয় নাই। আমাকে কেউ কোন কথা বলে নাই। কোন কথায় অবজ্ঞা করে নাই। আমার মনেও কোন কষ্ট নাই (ক্রন্দন)।…
>
> পিতঃ আমার কোন পীড়া হয় নাই। বৈদ্য, চিকিৎসক, গণকের কোন আবশ্যক নাই। আমার কোন প্রকার ঔষধের প্রয়োজন নাই। আমি (ক্রন্দন)… ।"

এরপর অবশ্য গণকঠাকুর রহস্য ভেদ করেছে এবং মিলনাত্মক পরিণতির আভাস দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু রাজপুত্রের বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হবার আগেই রাজার নিজের বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গেছে। বৃদ্ধ বয়সে রাজার এই তন্বীভার্য্যা গ্রহণ নিয়ে পুকুর পাড়ে মেয়েদের নানা রকম গল্প জমে। একজন বলেঃ "রাজার ত চোক ছিল?" জবাবঃ "চোক থাকলে কি হবে? মন যে এখনও হামাগুড়ি দেয়।" রাজপথে প্রজাদের কেউ কেউ প্রকাশ্যতই ঘোষণা করেঃ "বেটা উচ্ছিন্ন যাক। এমন মাগী-পাগলা রাজার রাজ্যে কি থাকতে আছে? যে মানুষ মেয়ে মানুষের গোলাম সে কি মানুষ!" (প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে উপরোদ্ধৃত বাক্যের অকথ্য শব্দটি সর্বত্র সেকালে হালের হেয় অর্থে ব্যবহৃত হোতো না।) কেউ প্রতিবেশীকে কটাক্ষ করেই বলেঃ

> "বুড়ো বয়সে বিয়ে কল্লে সকলেরই ঐ দশা হয়; তুমিও ত কিছু কিছু বোঝ।"
>
> —"এত না।"
>
> —"বড় লোকে আর ছোট লোকে অনেক তফাৎ।"

এর পরেই আমরা পরিচিত হই রাজার এই নবপত্নী রেবতীর সঙ্গে। নাটকের নাম বসন্তকুমারী হলেও এই নাটকের প্রাণ রেবতী। মীর মশাররফ হোসেনের কবিমানস বসন্তকুমারীর জটিলতাহীন নমনীয় সরল আবেগের গতিপ্রবাহের চেয়ে বেশি আকৃষ্ট হয়েছে রেবতীর প্রখর জটিল দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ হৃদয়দাহের প্রতি। কারণ সেখানে নাট্যকার খুঁজে পেয়েছেন জীবনের মোহনীয় স্মরগরল, মানুষের দেহনেশার ভীষণ মধুর রূপটি। সেই প্রেরণা সৃষ্টির দিক থেকে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ না করে থাকলেও, মীর মশাররফ হোসেনের পরিণত রচনার শিল্পরহস্যের মর্মভেদ করতে হলে, তাঁর সত্য-সাক্ষাৎকারের স্বরূপটিকে উপলব্ধি করতে হলে, তার জীবনারম্ভের এই রেবতী চরিত্রের পরিচয় নেয়া বিশেষ প্রয়োজন।

ইন্দ্রপুরের রাজপ্রাসাদে রাণী এবং যুবরাজ-মাতা হিসেবে প্রবেশ করে এই নবীনা নারী মৃত স্বপত্নী-পুত্র নরেন্দ্রের রূপমোহে মুগ্ধ হোলো। সম্পর্কবিরুদ্ধ প্রণয়ের সর্ববিস্মরণকারী দুর্বার আবেগ তার সকল ঔচিত্যবোধ ও বিবেকবুদ্ধি লুপ্ত করে দিল। রূপজ মোহে অন্ধ হয়ে প্রেমপত্র রচনা করল নরেন্দ্রের উদ্দেশ্যে, কিন্তু সে পত্র প্রেরণের পূর্ব মুহূর্তে রাজার প্রবেশ এবং সে চিঠির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ। তখন রেবতী লালসাপ্রদীপ্ত উদ্ভ্রান্ত প্রেমের সে নিবেদন লিপির এমন স্বাভাবিক ব্যাখা করল যে রাজা মনে করলেন যে পত্র তাঁকে উদ্দেশ্য করেই রচিত হয়েছে, তাঁর পুত্রের প্রতি নয়। নরেন্দ্র বিমাতার পত্র পেয়ে শিউরে উঠেছে এবং সংকল্প করেছে তার সম্মুখীন কখনো হবেন না। কিন্তু রেবতী তার রূপলালসার প্রেমপিপাসার নিবৃত্তির জন্যে কোন কৌশলকেই আজ আর হেয় মনে করে না। তাই রাজাকে বলছে ঃ

> "নাথ! তোমার বিবেচনা নাই। দেখ দেখি, আমি তোমায় কতদিন বলছি যে, যুবরাজ নরেন্দ্রকুমারের মুখখানি দেখতে বড়ই সাধ গেছে। আমার গর্ভ-জাতই না হোলো, আপনার সন্তান ত, তা মহারাজ! আমাকেও আপনার মত দেখতে হয়। একটিবার দেখা দিতে নাই? আমারও সাধ আছে ত! আপনার পুত্র ত, আমার গর্ভে না হোলো, তাইতে কি আমি তারে স্নেহ কোরবোনা, ভালবাসবো না? কেমন কথা বলছেন? ...মহারাজ আমি

> বিমাতা বটে, কিন্তু আমার মন তেমন নয়। ভগবান আমায় —করেছেন, কাজেই নরেন্দ্রের মুখপানে চেয়ে থাকতে হয়। মহারাজ, যুবরাজ আমায় ভালবাস্থন আর না বাস্থন, আমি তাঁকে আপনার প্রাণের চেয়েও ভালবাসি।" ইত্যাদি।

রাজার সঙ্গে নরেন্দ্রের নিকট লিখিত প্রণয়পত্র নিয়ে কপটাচরণ, বিমাতার পুত্রস্নেহের অন্তরালে দয়িতের প্রতি তীব্র কামনার অব্যক্ত আবেগকে ভাষা দেয়ায় মীর মশাররফ হোসেন নাটকীয় সংলাপ রচনার অপূর্ব কৌশল প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু এত করেও রেবতী তার ভয়ঙ্কর কামনার বিষময় ফলকে এড়াতে পারল না। নরেন্দ্র প্রকাশ্যত তাকে প্রত্যাখ্যান করল, তার প্রতি হৃদয়ের অবিমিশ্র ঘৃণা প্রকাশ করে বিদায় নিল। ক্রুদ্ধ ফণিনীর মতো গর্জন করে উঠল রেবতী, স্বামীকে ডেকে এনে নরেন্দ্রের বিরুদ্ধে এক কুৎসিৎ অভিযোগ শোনালো তাঁকে ঃ

> "মহারাজ! সে বড়ো ভয়ানক কথা। আমি সে মুখে আনতে পারিনা। আমার মরণই ভাল। পুত্রের এই কাজ! আমি না হয় বিমাতাই হলাম। ······(কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে) মহারাজ! ছিঃ! ছিঃ! বড় ঘৃণার কথা! আপনার কোন অপরাধ নাই, আমার মাথা আমিই খেয়েছি। নরেন্দ্রকে অন্তঃপুরে ডেকে এনে শেষে এই ফল হোলো! মহারাজ! ও দুরাচারের মাথা কেটে তুমি তোমার হাত অপবিত্র কোরোনা, কখনই কোরোনা, আমি বলছি, আমার সম্মুখে কুলাঙ্গারকে জ্বলন্ত অনলে প্রবেশের অনুমতি কর। ওর মৃত দেহ যেন আর চক্ষে দেখতে না হয়। ···যদি পারেন, তবে আমায় পাবেন। নচেৎ পুত্রের মায়া করেন, তবে আমার মায়া ত্যাগ করেন।"

এর পরের পরিণতি শোকাবহ। ভয়াবহ। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণের' শেষ দৃশ্যের মত দ্রুত পতন ও মৃত্যুতে আকীর্ণ। নরেন্দ্র অগ্নিতে প্রবেশ করেছে। তার সদ্য পরিণীতা বধূ বসন্তকুমারী তার অনুগামী হয়েছেন। রেবতী-লিখিত প্রেম পত্রও রাজার হস্তগত হয়েছে। তীক্ষ্ণ তরবারীর আঘাতে তৎক্ষণাৎ তিনিও রেবতীকে ইহজগত থেকে বিলুপ্ত করে দেন ও নিজে মূর্ছিত হয়ে ভূমিশয্যা গ্রহণ

করেন। এই পরিণতির ইশারা করেই নাট্যকার বসন্তকুমারী নাটকের অন্য নাম রেখেছেন ঃ 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা'। আলোচ্য নাটকের কেন্দ্রীয় ঘটনা ও ভাবের সঙ্গে আশ্চর্য মিল রয়েছে একুশ বছর আগে প্রকাশিত (১৮৫১) প্রথম বাংলা বিয়োগান্ত মৌলিক নাটক জি.সি. গুপ্তের 'কীর্ত্তিবিলাসের'। কিন্তু যা জি.সি. গুপ্তে নেই, তা হল 'বসন্তকুমারী'র কাহিনী গ্রন্থনের সুসংবদ্ধতা, সংলাপের বিচিত্র চাতুরী এবং এক সর্বাঙ্গীন প্রাণবন্ত ভাবপরিমণ্ডল। যা 'বসন্তকুমারী'তে নেই তা আছে ফরাসী নাট্যকার রাসিনের Phædraতে —যেখানে স্বপত্নীপুত্র Hyppolytusএর প্রতি স্মরাহত হয়ে রাণী তার ক্ষতাক্ত হৃদয়ের শোণিত দিয়ে গড়ে তুলেছে সংলাপের উত্তাপকে, তার অপমানিত প্রত্যাখ্যাত হৃদয়ের রোষস্ফুলিঙ্গ দিয়ে করে তুলেছে সে ভাষাকে প্রদীপ্ত, শাণিত। রেবতীর সংক্ষুব্ধ হৃদয়ের বিষজ্বালা এই গাঢ়তা, এই অমোঘতা, এই অনিবার্যতা নিয়ে 'বসন্তকুমারী নাটকে' বাস্তবতার বিভ্রম সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় নি।

না হোক। তবু 'বসন্তকুমারী নাটক' মীর মশাররফ হোসেনের রচনা সমূহের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এজিদ জ্বায়েদার সার্থক স্রষ্টার শিক্ষানবিশী কালের এই রচনা ভবিষ্যৎ পরিণতির বিশিষ্ট বীজ বহন করে বলেই এই গ্রন্থের এত বিস্তৃত আলোচনা।